Vol. 9 | No. 1 | 1965

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পদাবলী-সাহিত্যের ভাষা-বৈচিত্র্য

Volume	9
Issue	1
Year	1965
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিমানবিহারী মজুমদার
Published online	June 15, 1965
DOI	10.62328/sp.v9i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v9i1.1
Pages	1-21
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা
নবম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা
বর্ষা : ১৩৭২

পদাবলী-সাহিত্যের ভাষা-বৈচিত্র্য

বিমানবিহারী মজুমদার

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পদাবলী-সাহিত্যের আদিযুগের কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাব ও ভাষার উপর সার্থক গবেষণা করিয়া ঐ দুই মহাকবিকে বুঝিবার অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আমরা নেপাল ও মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পদগুলির সহিত কেবলমাত্র বাংলাদেশে প্রাপ্ত পদসমূহ আলাদা আলাদা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিনি "বিদ্যাপতি-শতক" গ্রন্থের ভূমিকায় ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে বিদ্যাপতির পদের আদিমরূপ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত আমার "চণ্ডীদাসের পদাবলী"তে প্রাক্-চৈতন্য যুগের বিশেষণহীন চণ্ডীদাসের খাঁটি পদ খুঁজিয়া বাহির করিবার কাজে ডাঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ১৩৪৩ সালের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় লিখিত একটি প্রবন্ধ আমার পথনির্দেশে সহায়তা করিয়াছে। সে কথা আমি ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছি।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি দুই বিভিন্ন ধারায় পদ রচনা করেন। একজনের পদ খাঁটি বাংলা অলঙ্কার-বাহুল্যবর্জিত, 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশিবার জন্য লেখা। অন্যের পদ রাজ-রাণীর মত অলঙ্কারভূষিতা, উহা মস্তিষ্কের আলোড়ন ঘটাইয়া হৃদয়ে পৌঁছায়।

উভয়ে কিন্তু প্রাকৃতভাষার পূর্ববর্তী কবিদের নিকট ঋণী। ঐ কবিদের নাম জানা যায় না ; কাল নির্ণয় করাও কঠিন। তবু তাঁহারা এত খ্যাতিমান ছিলেন যে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' এবং ষোড়শশতাব্দীর মধ্যভাগে কবি কর্ণপূরের অলঙ্কারকৌস্তুভে তাঁহাদের পদ ধৃত হইয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে যে, কি বিষয় নির্বাচনে, কি শব্দ চয়নে এই সব কবির রচনা পদাবলী সাহিত্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বর্ষাকাল আসিয়াছে। গাছে কদমফুল ফুটিয়াছে। ভ্রমর মধুলোভে ঘুরিতেছে। জলের ভারে শ্যামল মেঘ দেখা দিয়াছে। বিদ্যুৎ যেন তাহার বুকে নাচিতেছে। এত উদ্দীপনের প্রভাবে বিরহিণী নায়িকা বলিতেছে, প্রিয়সখি! বলতো আমার দয়িত কখন আসিবে। জাপানী কবিতার মতন ছোট্ট একটি পদে এত কথা কেমন সুন্দর ভাবে গুছাইয়া বলা হইয়াছে ঃ

ফুল্লা নীবা ভম ভমরা
দিট্টা মেহা জলসমলা।
নচ্চে বিজ্জু পিঅ সহিআ
আবে কন্তা কহু কহিআ॥ (প্রাকৃত পৈঙ্গলম্)

নীপ এখানে নীবা, শ্যামলা—সমলা, কদা বা কখন—কহিআ এবং কান্ত ছন্দের অনুরোধে 'কন্তা' রূপ ধারণ করিয়াছে। পরিবেশ পদাবলীর অনুকূল। পদাবলীতে মেঘকে মেহ বা মেহা ও ভ্রমণ করাকে ভম বহু স্থানে বলা হইয়াছে ঃ

মানের এই পদটিকে অনায়াসে বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায় ঃ

মানিনি মাণহিঁ কাহঁ ফল
এআ জ চরণ পড়ু কন্ত।
সহজ ভুঅঙ্গম জই নমই
কি করিয়ে মণিমন্ত॥ (প্রাকৃত পৈঙ্গলম্ ১।৬)

হে মানিনি! যদি এমনিতেই কান্ত পায়ে পড়ে তো মান করিয়া কি লাভ? যদি ভুজঙ্গ (সর্প, ব্যঙ্গ্যার্থ লম্পট) সহজেই নত হয়, তো মণিমন্ত্র প্রয়োগ করা কি জন্য?

কবি কর্ণপূর সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কারকৌস্তুভ লিখিলেও উদাহরণ দিতে যাইয়া অনেকগুলি প্রাকৃত পদ তুলিয়াছেন। ঐগুলি নিশ্চয়ই তাঁহার লেখা নহে। তিনি ছোটবেলা হইতে মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। প্রাকৃত ভাষায় পদ লিখিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার ছিল না। তাঁহার ধরা একটি মানের পদ :

হিঅঅং চেঅ অনচ্ছং মাণং সিনি ন উণ দে অঙ্গং।
আলিঙ্গন্তি পআনং নহরা পড়ি বিম্বিঅং কহুং॥ (২য় কিরণ)

তোমার হৃদয়ই অনচ্ছ (রোষের আবেশে কলুষিত) কিন্তু অঙ্গ সেরূপ অনচ্ছ নহে। দেখ, তোমার চরণ নখর প্রতিবিম্বিত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছে। অল্পকথায় এখানে ইঙ্গিত করা হইতেছে যে মানবশে নায়িকা নখছাড়া সকল অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এবং চোখও বন্ধ করিয়া আছেন।

মুরলীর প্রতি আক্ষেপের একটি প্রাকৃত পদও কবি কর্ণপূর ধরিয়াছেন :

অই পিঅসি গোবিআণং পেঅং
কহুস্স অহর পল্লঅং মুরলি।
নিঅপর বিবেঅ কুসলা
অম্হো নো হোন্তি সচ্ছিদ্দাঃ॥ (তৃতীয় কিরণ)

পিঅসি মানে পিবসি (পান কর) গোবিআনং মানে গোপিকাণাং অহর শব্দে অধর, বিবেঅ অর্থে বিবেক। হে মুরলি। শ্রীকৃষ্ণের যে অধরপল্লব গোপিকাদের পেয়, তুমি তাহাই পান করিতেছ। কি আশ্চর্য, যাহারা সচ্ছিদ্র তাহারা কোন্‌টা নিজের জিনিষ কোন্‌টা পরের তাহা বিবেচনা করে না।

প্রাকৃতপৈঙ্গলে ধৃত নৌকাবিলাসের পদটি অনেকে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু পদাবলীসাহিত্যে উহার প্রভাব সম্বন্ধে কোন আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। পদটি এই :

অরেরে বাহহি কাহ্ন নাব,
ছোড়ি ডগমগ কুগতি ন দেহি।
তই ইথি পদিহিঁ সঁতার দেই
জো চাহহি সো লেহি॥ (প্রাকৃতপৈঙ্গল ৯)

হে কৃষ্ণ, নৌকা চালাও, এই নৌকা ছোট, ইহাতে ডগমগ গতি দিও না (দোলাইও না)। এই নদীতে সাঁতার দিয়া (পার করিয়া) তুমি যাহা চাহ লইও।

ঠিক এইভাবে সোজাসুজি দেহদান করিতে রাজি হওয়ার কথা বৈষ্ণব পদকর্তারা বলেন নাই। বংশীবদন সখীদের সহিত কথাবার্তায় নায়িকার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :

মুচকি হাসিয়া নেইয়া যার পানে চায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে সেইজন ধায়॥

জ্ঞানদাসের রাধা বলেন :

নায়্যার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারি ধরিতে চায় কোরে॥

মুসলমান কবি সৈয়দ মর্তুজা প্রাকৃত পৈঙ্গলের উপর আর এক ধাপ আগাইয়া রাধাকে দিয়া বলাইয়াছেন :

পার কর পার কর নাইয়া কানাই।
কানাই মোরে পার কর রে॥
ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পন্থের চৌকিদার।
নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার॥
হইল হাটের বেলা না হৈল বিকাকিনি।
মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণি॥
সৈয়দ মর্তুজা কহে রাধে গোয়ালিণী।
কানাইয়ের বাজারে নষ্ট যত গোয়ালিণী॥ (ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত)
মুসলমান বৈষ্ণব কবি, (১ম খণ্ড)

এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সৈয়দ মর্তুজার পদে একটিও তথাকথিত ব্রজবুলি নাই। যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য মহাশয় "বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি" নামক গ্রন্থে যে ১০২টি পদ সঙ্কলন করিয়াছেন তাহার মধ্যে এক সালবেগ ছাড়া অন্য কোন কবি ব্রজবুলি ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা সকলেই পদকর্তা চণ্ডীদাসের মতন খাঁটি বাংলায় পদ লিখিয়াছেন।

সালবেগ যে উৎকলের লোক তাহা পদকল্পতরুতে ধৃত তাঁহার পদ দেখিলেই বুঝা যায়। তিনি নীলাচলচন্দ্রের স্তবে লিখিয়াছেন ঃ

সে বাতি পড়্যারি ঘট ভরি বারি
ঢারউ তাকঙ্কু মাখন্তি। (তরু ১৫৪২)

রাধার রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বলেন ঃ

জোমি জল বহন্তি বেণি ঝাঁপি ঝলকিতা। (তরু ২৪৭২)

কথিত আছে যে তিনি বৈষ্ণব হইয়া শেষ জীবন বৃন্দাবনে কাটাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার লেখা আরতির পদে ব্রজবুলির কিছু ছাপ দেখা যায় ঃ

জয় জয় রাধে গোপাল গোপাঙ্গনা রে,
শীশ মোর — মুকুট নট, শোহে কটি পীত-পট
কিঙ্কিনি অধিক শোহাও না রে। (তরু, ১৯৭২)

ব্রজমণ্ডলের লোকে যাহাতে বাংলা পদ সহজে বুঝিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ব্রজবুলি ব্যবহার করা হইত বলিয়া মনে হয়। আসামের শঙ্কর দেব, উড়িষ্যার রায় রামানন্দ, গুজরাটের নরসি মেহতার রচনাতেও ব্রজবুলির ব্যবহার দেখা যায়। রায় রামানন্দের সুপ্রসিদ্ধ পদ ঃ

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জনি॥

১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বৎসর পরে কবি কর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে ধরিয়াছেন। সেইজন্য ইহার অকৃত্রিমতায় সন্দেহ করা চলে না। উড়িয়া সালবেগের পদ হইতে বুঝা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীতে উৎকলবাসীর পক্ষে ব্রজবুলিতে পদ লেখা অসম্ভব ছিল না।

গোপালভট্ট দক্ষিণ দেশের লোক। তাঁহার ভণিতাযুক্ত দুইটি পদ পদকল্পতরুতে (১০৮৮, ২৮৩৩) পাওয়া যায়। আজও ব্রজমণ্ডলে একাধিক মাদ্রাজী ভক্ত দেখিয়াছি যাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিয়া প্রথমে বুঝিতে পারি নাই যে বাংলা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও তাঁহার পরিবারদের

ঘনিষ্ট সংসর্গে আসিয়া গোপালভট্টের পক্ষে ব্রজবুলিতে পদ লেখা কিছুমাত্র বিস্ময়জনক নহে। কৃষ্ণের সহিত রাধা কুঞ্জে মিলিত অবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহাদের রূপের বর্ণনা করিতে যাইয়া গোপালভট্ট বলিতেছেন :

অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীড়
পুছত বাত অতি নিবীড়
প্রেমতরঙ্গে ঢরকি পড়ত
কমল মধুপ সঙ্গ হে। (১০৮৮ তরু)

ভীড় শব্দের অর্থ সম্মিলিত। রাধা ও কৃষ্ণের অঙ্গে অঙ্গে ও বাহুতে বাহুতে সম্মিলন হইয়াছে। তাঁহারা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে কথাবার্তা বলিতেছেন। প্রেমের ঢেউয়ে যেন উছলিয়া পড়িতেছে কমল মধু পানে রত ভ্রমর। এই ধরণের ভাষা ব্রজমণ্ডলের পূরবিয়া ও পশ্চিমিয়া ভক্তদের বোধগম্য হইবে বলিয়া গোপাল ভট্ট মনে করিতেন। তিনি ঐ বিষয়েই অন্য একটি পদে লিখিয়াছেন :

মধুরিম হসে বসনতে ঝাঁপি শোহত
মেহতে জেহ্ন বিজুরি গোপ্যো।
কণ্ঠহি লোলত মোতিম হার
কনক-মুকুরে জেহ্ন তারক রোপ্যো॥ (২৮৩৩)

শ্রীরাধার মুখে হাসি ফুটিয়াছে, তিনি কিন্তু তাহা নিল শাড়ী দিয়া ঢাকিতেছেন। নীল শাড়ী যেন মেঘ, আর হাসিটুকু যেন বিদ্যুৎপ্রভার মতন শোভা পাইতেছে। তাঁহার গলায় যে মুক্তার হার দুলিতেছে তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে যে সোনার দর্পণে যেন তারকাবলী রোপিত হইয়াছে। রাধার রঙ সোনার মতন, তাঁহার কান্তি দর্পণের মত স্বচ্ছ।

বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর মধ্যে একমাত্র রঘুনাথ দাসই পশ্চিম বঙ্গের খাঁটি অধিবাসী। কিন্তু তিনিও মঙ্গল আরতি লিখিবার সময় এমন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা আমাদের কাছে এখন দুর্বোধ্য হইলেও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন ভাষাভাষী ভক্তদের নিকট সহজবোধ্য ছিল।

হরত সকল সন্তাপ জনমকো
মিটত তলপ যম কালকি।
আরতি কিয়ে মদন গোপাল কি॥ (তরু ২৮৬৯)

জন্ম বা জীবনের সকল সন্তাপ দূর হয়, কালরূপ যমের আহ্বান (তলপ, আরবী তলব্ শব্দ হইতে ; সংস্কৃত তল্প বা শয্যা ধরিলে কোন মানে হয় না) ঘুচে। ঐ পদে রঘুনাথ দাস গোলাপের ফার্সি প্রতিশব্দ গুলাব ব্যবহার করিয়াছেন ঃ

চরণ-কমল পর নূপুর বাজে
আজরি কুসুম গুলাবকি।
সুন্দর লোল কপোলক ছবি সোঁ
নিরখত মদন গোপালকি ॥

কিন্তু দাসগোস্বামী শ্রীরাধার যে রূপ বর্ণনার পদ লিখিয়াছেন তাহাতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দরাজি প্রয়োগ করিয়াছেন। কেবলমাত্র 'যেন',' জিনি' 'মাঝ' 'তাহে' এবং "পহুঁ" এই পাঁচটি বাংলাশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দুই চরণ নমুনা দিতেছি ঃ

উরজ-লম্বি-বেণি মেরু পর যেন ফণি
অভরণ বহু মণি গজ-গমনী।
বিণা করিবাদিণি চরণে নূপুর-ধ্বনি
রতি-রসে পুলকিনি জগ-মোহিনী ॥ (তরু, ২৪৬৭)

এই দুইটি উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তগণের নিকট তাঁহার পদকে বোধগম্য করা—কোন ভাষাতাত্ত্বিক রীতি অনুসরণ করা নহে।

ঐ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে গাহিবার জন্য ত্রিশটি ক্ষণদায় বিভক্ত যে 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' সংকলন করিয়াছিলেন তাহাতে অধিকাংশ পদই বাছিয়াছিলেন ব্রজবুলিতে অথবা সংস্কৃতে লেখা পদ হইতে। তিনি নিজের লেখা ৫৩টি পদ উহাতে স্থান দিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটির ভাষাই ব্রজবাসীদের বোধগম্য। যথা ঃ

এ সখি! অব সব পরীখণ ভেলি।
তুহুঁ নবপ্রেম-অমৃত-রস বেলী ॥
লাগলি শ্যাম-তমালকো অংস।
কুল ভয়ো সব জগ অবতংস ॥
এ দোহুঁ মিলন কবহুঁ না ছোটে।
মূঢ়কো যতনে বেলী বরু টুটে ॥ (ক্ষণদা, ১৩।৪)

সখি! এখন সব রকম পরীক্ষা করা হইল, তুমি নূতন প্রেমরূপ রসামৃতের বেলী, বল্লী বা লতাস্বরূপ। তুমি শ্যামরূপ তমালের স্কন্ধে জড়িত হইলে; তাহাতে সমস্ত জগতের শিরোভূষণ হইলে। এ দুইয়ের মিলন কখনও ভঙ্গ হয় না। মূর্খলোকে যদি চেষ্টা করে তাহা হইলে লতা বরং ছিঁড়িয়া যায়।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর দেখাদেখি মনোহর দাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পশ্চিমা ভক্তদের জন্য একখানি 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' সংকলন করেন। উহা ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে রাধাকুণ্ড কুসুমসরোবর হইতে বাবা কৃষ্ণদাস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ৪৪ জন কবির ২২৩টি পদ আছে—তন্মধ্যে হরিবল্লভ উপনামধারী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ৬টি পদ ধরা হইয়াছে। সঙ্কলয়িতা মনোহর দাসজীর ২১টি পদ আছে। ঐ মনোহর দাস 'অনুরাগবল্লীর' রচয়িতা মনোহর দাসের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয়। এই অনুমান সত্য, কেন না গ্রন্থের অধিকাংশ গৌরচন্দ্রিকা তাঁহার রচনা। সেগুলির মধ্যে বাঙ্গালীত্বর সন্ধান মেলে। যথা:

নিশিদিন ইহৈ সোচ মেরে উর।
কৌন কাজ ব্রজরাজ কুঁবর বর ধার‍্যো গৌরে কলেবর॥
সুখকো পরম সদন বৃন্দাবন পরিজন নিপট সনেহ।
সো সুখ ছাড়ি বসত নদিয়াপুর সমঝ পরত নহিঁ এহ॥ ৫।৪

এখানে ছোড়ি বা ছোড়কে শব্দের পরিবর্তে লেখক খাঁটি বাংলা 'ছাড়ি' ব্যবহার করিয়াছেন। উহাতে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ব্রজ ভাষার পদ এইরূপ দেখা যায়:

হরি হরি কৌন কৃপা রস এহ।
ধন্য গৌড় ধরণী জহাঁ লোকন অবলোকত হরি গৌর দেহ॥
বিনহি জতন, নব প্রেম রতন, সো সবহিন কে যহাঁ ভর‍্যো রোহ।
সবহী রসিক সবহী হরি বল্লভ রাজত যহাঁ পরস্পর নেহ॥ ৯।১

চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতির প্রবর্তিত রীতিতে রচনা করিয়া সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন গোবিন্দ দাস কবিরাজ। তিনি শুধু বাঙ্গালীর জন্য পদ লিখিতেন না। ব্রজের বৈষ্ণবদের আস্বাদনের জন্য তিনি শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট পদ রচনা করিয়া পাঠাইতেন। ভক্তিরত্নাকরে

প্রদত্ত শ্রীজীবের সংস্কৃতপত্র হইতে জানা যায় যে বৃন্দাবনে তাঁহার পদের খুব সমাদর হইত। শ্রীজীব গোবিন্দদাসকে লিখিতেছেন—"সম্প্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনাময় স্বীয়ানি সীতানি প্রস্থাপিতানি পূর্বমপি যানি তৈরমৃতৈরিব তৃপ্তা বর্তামহে, পুনরপি নূতনতত্তদাশয়া মুহু রপ্যতৃপ্তিঞ্চ লভামহে, তস্মাত্তএ চ দয়াবধানং কর্তব্যং" অর্থাৎ সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাত্মক আপনার স্বরচিত গীত সকল যাহা পূর্বেই পাঠাইয়াছেন সেই অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। পুনরায় নূতন নূতন তাদৃশ গীতের আশায় আবার অতৃপ্তি বোধ করিতেছি। অতএব সে বিষয়ে অবহিত হইবেন। শ্রীজীব নিশ্চয়ই একা একা পদ আস্বাদন করিতেন না। পদগুলি গান করিবার জন্যই লেখা হইয়াছিল এবং শ্রীজীব ভক্তদের সঙ্গে গানই শুনিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকা হইতে বুঝা যায় গোবিন্দদাস কবিরাজ কোন্ বিদ্যাপতির ভাষা অনুসরণ করিয়াছিলেন। রূপ সনাতন-শ্রীজীব-রঘুনাথ যে কারণে সংস্কৃতে বই লিখিয়াছিলেন, গোবিন্দ কবিরাজও সেই জন্য তথাকথিত ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাস ছিলেন ভাষার যাদুকর। তিনি ভাষাকে অবলীলাক্রমে যথেচ্ছ খেলাইতে পারিতেন। আমাদের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে "গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ" নামক বই বাহির হইয়াছে তাহাতে ৩৫টি চিত্রগীত (১১৪—১৪৪ সংখ্যক পদ) সংগৃহীত হইয়াছে। "অবনত আনন আঁচরে গোই" "কামিনি কানু কহল কত মোর," "কুন্দন-কনক-কলিত কর-কঙ্কণ" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "শিশিরক শীত সমাপলি সুন্দরি মোহন সুরত-সন্দেশে" এবং "হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই" দিয়া ঐ চিত্রগীত পর্যায় শেষ হইয়াছে। ভাষার কারুকার্যের চাপে গীতগুলির মধ্যে চিত্র হয়তো ভাল ফুটে নাই। কিন্তু কবি যখন বলেন :

মধু-গুড়-লোভিত বাউল চীত।
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত॥

তখন কৃষ্ণের সখা মধুমঙ্গলের পেটুকপণা মানস চক্ষুর সামনে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। বেচারা একটু মধু বা গুড় যোগাড় করার জন্য নিজের পৈতাটিও

বন্ধক দিতে রাজী। শ্রীচৈতন্যের ভাব-বিচিত্র জীবনের আলেখ্য দুইটি কালির আঁচড়ে কেমন আঁকিয়াছেন :

সঘনে রোদন সঘনে হাস।
আনহি বরণ বিরস ভাষ॥ (১৫ সংখ্যক পদ)

অথবা

নটন ঘটন টভ পেল ভোর।
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল॥
রোয়ত হসত ধরণি খসত।
শোহত পুলক পাঁতিয়া॥ (১৭ সংখ্যক পদ)

খাঁটি বাংলা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দ মিশাইবার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল গোবিন্দ দাসের। তিনি লিখিয়াছেন :

ঘুমে আলপেয়ে কত পরবন্ধ।
রভসে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ॥

মিথিলার এক পণ্ডিত গোবিন্দদাসকে মৈথিল কবি প্রতিপন্ন করিবার জন্য এক-খানি বই লিখিতে যাইয়া ঐ পদের "ঘুমে" শব্দের মানে করিয়াছেন—ঘুমতা ফিরতী হ্যায়—পায়চারি করিতে করিতে কত রকমের কথা বলে। 'ঘুমে' মানে যে নিদ্রায় বা স্বপ্নে তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই।

গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যামদাস তাঁহার পিতামহের রীতি অনুসরণ করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার লেখা "গোবিন্দ-রতি-মঞ্জরীতে" তিনি স্বকৃত অনেকগুলি পদ ধরিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য অনেক পদ ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। 'রসবিলাস বল্লী' নামক রাধাকুণ্ডের পুথি হইতে তাঁহার একটি অপ্রকাশিত পদ নীচে দিতেছি :

উতপত দেহ, থেহ নাহি বান্ধই, অনুকূল প্রতিকূল ভান।
সঘন নিশ্বাসে নিমিখ নাহি লোচনে, কি ভেল পাপ পরাণ॥
সজনি শুনইতে মানবি আন।
নিকসল চারু চিত্রপটে হট সঞে এক মূরতি অনুপাম॥
অভিনব শ্যাম জলদ নবকৈশোর মরকত জিনিঞা সুঠান।
বরিহা মিলিত ললিত নবমালতি ভালে চূড়া চিকণ বনান॥

মঝু মুখ হেরি ঢালি নয়নাঞ্জন হানল ভাণ্ডু সন্ধান।
তব্ ধরি উনমত হৃদয় থির নহ ভাল মন্দ একু না জান॥
অনল দহন ঘন, চাঁদ কিরণ যেন, হিমকর অনল সমান।
হেন বিপরিত রূপ হেরি ঐছন ঘনশ্যাম দাস পরমাণ॥

চিত্রপটে শ্যামসুন্দরকে দেখিয়া রাধা উন্মাদিনী হইয়াছেন তাহারই বর্ণনা। উতপত — উত্তপ্ত; থেহ — স্থৈর্য বা ধৈর্য; আন — অন্যরকম। হট সঞে— জোর করিয়া অথবা হঠাৎ; বরিহা—বই; ভাণ্ডুসন্ধান—ভ্রূভঙ্গী করিয়া কটাক্ষ; তবধরি— সেই হইতে। পরমাণ — প্রমাণ বা সাক্ষী।

ঘনশ্যাম পাণ্ডিত্যপূর্ণ রসিকতার সহিত রাধাকৃষ্ণের এক বিচিত্র আলাপ আর একটি অপ্রকাশিত পদে লিখিয়াছেন ঃ

"কহই পুনপুন করত হুঙ্কার।
হরি হামি জানি না কর পরচার॥"
"পরিহরি সো গিরি কন্দর মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওল গিরিরাজ॥"
"এ ধনি শুনহ হাম মধুসূদন নাম।"
"চলু কমলালয় মধুকর ঠাম॥
"এ ধনি শোনহ হাম নবঘন শ্যাম।"
"তনু বিনু গুণ কহে কিয়ে নিজ নাম।"
"শ্যাম মূরতি হাম তুহুঁ কিনা জান।"
"তারাপতি ভয়ে বুঝি অনুমান।"
যবসঞে দীপ রতন উজিয়ার।
কৈছনে পৈঠব ঘর আঁধিয়ার॥
পরিচয় পর যুগ সব ভেল আন।
হাসি পরাজয় মানল কান॥
তৈখনে জাগল মনমথ স্মর।
অব ঘনশ্যাম মনোরথ পূর॥

(বরাহনগর পাঠ বাড়ীর ১২৬ সংখ্যক
কীর্তনানন্দের পুথির ১৪৯ পত্র)

রাধা ঘরের মধ্যে আছেন, বাহির হইতে কৃষ্ণ বলিতেছেন জোরে জোরে, —বারবার বলিতেছি আমি হরি এসেছি, একথা লোকে যেন না জানে। রাধা বলেন হরি তো সিংহ, তিনি হঠাৎ গিরি-কন্দর ছেড়ে আমার ঘরে আসিলেন কেন? তখন কৃষ্ণ বলিলেন, সুন্দরি! আমি মধুসূদন। রাধা বলেন ও তাই বুঝি! বেশ তো মধুসূদন ভ্রমর, তিনি কমলের কাছে যান না কেন? কৃষ্ণ তখন বলেন, আরে উল্টা বুঝছো কেন? আমি নবঘনশ্যাম। রাধা উত্তর দেন, মেঘের আবার মুখ আছে না কি? সে আবার নিজের গুণ ও নাম বলে কি করে? কৃষ্ণ বলেন আরে মেঘ নয়, আমি শ্যাম মূর্তি। রাধা বলেন, তাই বুঝি চাঁদের ভয়ে লুকিয়ে বেড়ানো হচ্ছে? কিন্তু আমার ঘর তো রতন দীপে উজ্জ্বল; তুমি আঁধার স্বরূপ, ঘরে ঢুকবে কেমন করে? অবশেষে উভয়ের যখন মিলন হইল, তখন কানাই হাসিয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের মনে বীরমন্মথ জাগিল; তখন ঘনশ্যামের মনোরথ পূর্ণ হইল। ঘনশ্যাম শব্দ এখানে দ্ব্যর্থক, কবিকে ও কৃষ্ণকে বুঝাইতেছে।

পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস পূর্ববর্তী কবিদের বন্দনায় লিখিয়াছেন যে ঘনশ্যাম ও বলরাম "কবি-নৃপ-বংশজ"। এখানে কবি-নৃপ মানে কবিরাজ ও কবিদের রাজা গোবিন্দদাস। ঘনশ্যাম যে গোবিন্দদাসের পৌত্র, দিব্যসিংহের পুত্র —একথা তিনি নিজেই গোবিন্দরতিমঞ্জরীতে বলিয়াছেন। কিন্তু বলরামের সঙ্গে গোবিন্দদাসের কি সম্বন্ধ, তাহা জানা যায় না। শ্রীখণ্ডের একজন লেখক বলেন যে বলরাম কবিরাজ ছিলেন গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় কিন্তু ভাগনে তো তাঁহার নিজের বংশের লোক হইতে পারেন না; তখনো তো স্বগোত্র বিবাহের প্রচলন হয় নাই। বলরামদাস নামে যে একাধিক কবি আছেন তাহা কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ বলরামের কোন্ পদ তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৯৭৮ সংখ্যক পুথিতে আছে "বলরাম কবিরাজ ঠাকুরের পদাবলী"। উহাতে তাঁহার ২০ টি পদ আছে। সবগুলিই গোবিন্দদাসের কবি-শৈলী অনুসরণ করিয়া লেখা। প্রথম পদটি হইতেছে রসালসের ঃ

শ্যামর নাগর বর মদ কুঞ্জর
মাতল রস উনমাদে।
লুনি পুতলি জনু কুওরি সুনায়রী
মুরছলি অতি অবসাদে॥
হরি হরি কৈছে চলবি ধনি গেহা।
নিধুবন-সমর পরাভব-কাতরি
সুতলি দুবরি দেহা॥ ইত্যাদি।

অন্য ১৯টি পদ ও বিলাসের। কিন্তু নিত্যানন্দের পরম ভক্ত এক কবি বলরামদাস ছিলেন, যাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বন্দনায় লেখা হইয়াছে :

সঙ্গীত কারক বন্দোঁ বলরাম দাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর অধিক বিশ্বাস॥

এই কবির গোষ্ঠের পদগুলি সুবিখ্যাত। সাহিত্য-পরিষদের পুথির ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে সাদা বাংলায় লেখা সখ্য ও বাৎসল্য-রসের পদগুলি নিত্যানন্দের ভক্ত বলরামদাসের লেখা; আর আলঙ্কারিক ভাষায় ব্রজবুলিমিশ্রিত সম্ভোগের পদগুলি গোবিন্দদাস কবিরাজের বংশোদ্ভূত বলরাম কবিরাজের। প্রথমোক্ত বলরাম দাসের একটি পদ ভক্তি রত্নাকর (পৃঃ ৮৩৭) হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ভাষার নমুনা দিতেছি :

ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল।
সব অঙ্গে চন্দন দোলয়ে বনমাল॥
বিশাল হৃদয়ে গজ-মুকুতার হার।
পদতলে তাল উঠে নূপুর ঝঙ্কার॥
ছন্দ-বিছন্দে কত জানে অঙ্গ ভঙ্গি।
নদীয়া নগরে নাই এত বড় রঙ্গী॥
কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি মৃদু তানে।
গন্ধর্ব তাণ্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ানে॥
পঙ্কজ সঙ্কোচ পায় দেখিয়া নয়নে।
হাসিতে বিজুরি ছটা পড়য়ে দশনে॥
বাঁধুলি জিনিয়া রাঙ্গা ওট খানি হাস।
ওরূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম দাস॥

পদটিতে প্রত্যক্ষদর্শীর রচনার ছাপ আছে। নিমাই পণ্ডিত যে ভাল গান করিতে পারিতেন তাহার বর্ণনাও এখানে পাওয়া যায়। এই ধরণের লেখার সহিত কবিরাজ বলরাম ঠাকুরের আদিরসে ভরপূর পদের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে আধুনিক পদসংগ্রহ গ্রন্থের সম্পাদকদের কৃপায়।

আমার মাতামহ সুপ্রসিদ্ধ কীর্তন-সম্রাট অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজীর সংগ্রহ হইতে নিত্যানন্দভক্ত বলরামদাসের একটি অপ্রকাশিত পদ তুলিয়া তাঁহার কথ্য ভাষায় রচনার নমুনা দিতেছি ঃ

কি কর মায়ের কোলে ভেয়ারে কানাই।
হৈল অধিক বেলা চল গোঠে যাই।
রাজভোগের ভোগী হৈয়া বসিআছ ঘাটে।
কে তোমার নফর আছে ধেনু রাখে মাঠে॥
শুনিয়া গোঠের কথা বলে নন্দরাণী।
দুধের ছাওয়াল মোর এই নীলমণি॥
কনেড়া কুসুম যিনি ননী-ছাঁকা তনু।
কেমনে ফিরিবে বনে ফিরাইবে ধেনু॥
রাম কানু পানে ঘন চাহে নন্দরাণী।
বলরামদাস তঁহি কাতর পরাণী॥

এই যে সাদামাঠা পরাণ-কাড়া ভাষা ইহাই শ্রীচৈতন্য যুগের বিশিষ্ট ভাষা। চৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবে বাঙ্গালীর মনে ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল। তখন নরহরি সরকার, গোবিন্দ আচার্য, মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষ, রামানন্দ বসু, শঙ্কর ঘোষ, শিবানন্দ সেন, বাসুদেব দত্ত, প্রভৃতি কবি যে ভাষায় পদ লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র কষ্টকৃত প্রয়াস বা কৃত্রিম আলঙ্কারিক প্রয়োগ ছিল না। প্রাণের কথা হৃদয়ের দুয়ারে যাইয়া ঘা মারিয়াছে। যাঁহারা পদাবলী সাহিত্যের আলোচনা করিতে যাইয়া কেবলমাত্র ব্রজবুলির পদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবিদের রচনার প্রতি যথোচিত মর্যাদা দিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাপতির রীতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের রচনাশৈলী অধিক অনুসৃত

হইয়াছিল। কয়েকটি উদাহরণ দিলে উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার যার্থাথ্য উপলব্ধি করা যাইবে।

গোবিন্দ ঘোষ শ্রীচৈতন্য যুগের প্রথম বৈষ্ণব কবি। গয়া হইতে ফিরিবার পর গৌরাঙ্গ প্রেমভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন ও বাংলা ও আসাম হইতে ভক্তবৃন্দ তাঁহার নিকট চলিয়া আসেন। কিন্তু ঐ ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি পূর্বদেশ—যাহা বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তান — সেইখানে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে একমাত্র গোবিন্দ ঘোষই তাঁহার সম্বন্ধে পদ লিখিয়াছেন। পদটিতে ব্রজবুলির কোন চিহ্ন নাই ঃ

গোরা গেল পূর্বদেশ নিজগণ পাই ক্লেশ
বিলপয়ে কত পরকার।
কান্দে দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া শুনিতে বিদরে হিয়া
দিবসে মানয়ে অন্ধকার॥ ইত্যাদি (তরু ১৫৯৭)

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের পদের সহিত ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর পদ অনেকেই এক বলিয়া ধরেন। কিন্তু শেষোক্ত কবি নিজেই নীচে লিখিত পদটি ধরিয়া লিখিয়াছেন যে "শ্রীনরহরি সরকার ঠক্কুরস্য গীতমিদং"

গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥
সুরধুনী দেখি পহু যমুনার ভনে॥
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥ ইত্যাদি (তরু ২১২২)

এইরূপ ভাষায় নরহরি-ভণিতায় শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব বর্ণনামূলক অনেকগুলি পদ (যথা, তরু ৩০৭, ৩১৬, ৭৯৯, ৮২০, ১৬৪৩, ২২৫৯) পদকল্পতরুতে আছে। সেগুলি নরহরি সরকারের রচনা, নরহরি চক্রবর্তীর নহে। চক্রবর্তীর রচনায় এমন সাবলীল স্বচ্ছন্দগতি নাই; এমন ভাবের ব্যঞ্জনাও নাই। কেবল-মাত্র প্রভুর পরিবর্তে পহু শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া এই সব পদকে ব্রজবুলির পদ বলা যায় না।

শ্রীচৈতন্যের যুগে ধামালী বা ঢামালি ধরণের রঙ্গরসের পদও কেহ কেহ লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন গোবিন্দ আচার্য, যাঁহার সম্বন্ধে

বৈষ্ণববন্দনায় বলা হয় :

গোবিন্দ আচার্য বন্দোঁ। সর্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে রামগোপাল দাস 'রসকল্পবল্লী'তে শ্রীগোবিন্দ আচার্য ঠাকুরের রচনা বলিয়া নীচে লিখিত পদটি ধরিয়াছেন :

ঘন ঘন বরিখে বিজুরি ললপে।
তাহা দেখি প্রাণ মোর থরহরি কাঁপে॥
ছোড় ছোড় অঞ্চল নিলজ মুরারি।
লাজ নাহি তোর আস্তে হাম পর নারি॥
তোড়লি কাঁচলি ছিঁড়লি হার।
নখরে বিদারলি পয়োধর-ভার॥
তা সঞে ঢামালি করহ বনআরি।
তুহু চঞ্চল বড় সো তৈছে নারি॥

(রসকল্পবল্লী, পৃঃ ১৫৬)

ঐ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে "হোলি খেলাতে ঢামালি কথন বহু হয়।"

ধামালীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় লোচনের পদে। লোচন নরহরি সরকারের শিষ্য। একটি ধামালী রামগোপাল দাস তুলিয়াছেন :

কোন দেশে ছিলা আগো মাগো।
মোর বোল বুলিতে তোমার মুখে পড়িত লালা
এবে কোন কাজে নাহি লাগো॥
কুলের বৌহারি মোরা বাড়ীর বাহির নহি
কালা দেখিতে তিন বেলা।
আচট ঘুমের বেলে শয়ন স্বামীর কোলে
স্বপনে উঠিয়া দেখি কালা॥
পাঁকের পুকুরে তুমি পরকে নামায়াছ
পাখানি তোমার নাহি তিতে॥
লোচন বোলেন দিদি ঐ দুঃখে কান্দি আমি
উচিত বুঝাও তুমি চিতে॥ (ঐ পৃঃ ১০০)

'আচট ঘুম' কি পদার্থ বুঝা গেল না। অন্য কোন অপ্রচলিত শব্দ ঐ পদে প্রয়োগ করা হয় নাই। মেয়েলি ন্যাকামীর অপরূপ দৃষ্টান্ত নীচের পদটিতে পাওয়া যায়ঃ

তোমরা নাকি বল আমি কানুর সনে আছি।
এ বোল বলিতে মুখে না হানিল মাছি॥
যে দিগে কানুর ঘর সে মুখে না বসি।
সতী সাধে সে মুখের বায়ু না পরশি॥

কে ধরিল হাতে নাতে কে দেখিল কোথা।
মিছামিছি বিড়ালিনী তোলায় নানা কথা॥
না জানিয়া না শুনিয়া এ বোল বলে কে।
পুত-খাইলির মাথা খেয়ে ভাজা গেল দে॥
এ রূপ যৌবন আমি কোথা লইয়া থোব।
মিছা কথা লাগি মাগো কত আমি স'ব॥
লোচন বলে আগো দিদি কারে তোমার ডর।
শ্যাম নাগর লয়ে তুমি সুখে কর ঘর॥

(১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত পদকল্পলতিকা, ২৮ পৃঃ)

বাংলাদেশের কবিকুলের মধ্যে জ্ঞানদাসই সর্বপ্রথম বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার সে চেষ্টা সুফল হয় নাই বলিয়া তিনি ঐ পথ ছাড়িয়া দিয়া চণ্ডীদাসী ধরণে পদ রচনা আরম্ভ করেন। বিদ্যাপতির সার্থক অনুসরণ করেন তাঁহার পরবর্তী কবি গোবিন্দ দাস। জ্ঞানদাসের প্রথম যুগের ব্যর্থ অনুকরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিদ্যাপতির নায়িকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় বলিয়াছেনঃ

থির নয়নে অথির কছু ভেল।
উরজ-উদয় থল লালিম দেল॥

জ্ঞানদাস ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেনঃ

উলসল উরথল অব ভেল রে।
আয়ত হোয়ত নয়ান রে।

বিদ্যাপতির রাধা যখন নব-তারুণ্য লাভ করিলেন, তখন :

কো কহে বালা কো কহে তরুণী ॥
কেলিক রভস যব শুনে।
অনতএ হেরি ততহি দএ কাণে ॥

জ্ঞানদাস উহার অনুকরণে লিখিয়াছেন :

কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী ॥
রস পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব।
রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহিঁ যাব ॥

বিদ্যাপতিতে দেখি কুট্টিনী নায়িকাকে বুঝাইতেছে যে মালতী ফুল ফুটিলেই ভ্রমর তাহার নিকট আসিবে, সে নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়াও মালতীর মধু পান করিতে চায় :

রসমতি মালতি পুনুপুনু দেখি।
পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি ॥

এই ব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্তিটি জ্ঞানদাসের পদে সাদামাঠা রূপ লইয়াছে :

তুহু যে সুচেতনি বুঝ সব কাজ।
মধুকর বিনু নাহি মালতী সাজ ॥

এই ধরণের ব্যর্থ অনুকরণ ছাড়িয়া জ্ঞানদাস যখন স্বকীয় প্রতিভার উৎসের সন্ধান পাইলেন তখন তাঁহার লেখনী হইতে বাহির হইল :

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তর বিদরে কি জানি কি করে পরাণ ॥

রূপ যেন প্রবহমান তরল পদার্থ। শ্রীকৃষ্ণের রূপের সঙ্গে কোন দীঘি বা নদীর তুলনা দেওয়া চলে না ; কুল কিনারা দেখা যায় না এমন সমুদ্রের সঙ্গে শুধু তাহার উপমা দিতে হয়। সেই সমুদ্রে রাধার চোখ একেবারে ডুবিয়া রহিল ; তাহার আর উঠিবার সাধ্য নাই। এদিকে আবার সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা যে মন সেও শ্রীকৃষ্ণের যৌবনের বনে প্রবেশ করিয়া পথ ভুলিয়াছে ;

আর সে বনের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। চোখ এবং মনের যখন এমন অবস্থা তখন রাধা ঘরে ফিরিবেন কিরূপে? তাই ঘরে যাইবার পথ আর ফুরায় না। ফিরিয়া ফিরিয়া কানাইয়ের পানে চাহিতে থাকিলে আর পথ শেষ হয় কি করিয়া? রাধার হৃদয় তো বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; প্রাণ থাকিবে কি যাইবে তারও ঠিক নাই। রাধা বুঝিয়া উঠিতে পারে না তাহাকে কৃষ্ণের রূপই টানিতেছে, কি গুণে মন বাঁধা পড়িয়াছে। এত সূক্ষ্ম বিচার করিবার মতন শক্তি কি আর রাধার আছে, তাহার "মুখেতে না ফুরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে"। সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে চিত্রধর্মী কাব্যের এমন নিদর্শন আর পাওয়া যায় না।

পদকল্পতরুর সংকলনের পর তিনজন প্রতিভাবান কবির অভ্যুদয় হয়। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম জগদানন্দ। বৈষ্ণবদাস তাঁহার সাতটি মাত্র পদ ধরিয়াছেন—সেগুলিকে জগদানন্দের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান বলা যায় না। মধুর শব্দচয়ন করিয়া অপূর্ব ঝঙ্কার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জগদানন্দের অসাধারণ। কুঞ্জভঙ্গের পদে তিনি লিখিয়াছেন:

তড়িত-জড়িত, জলদ ভাঁতি।
দুহুঁ শুতি সুখে, রহল মাতি॥
জিনি ভাদর্, রস বাদর।
পরমাদরে শেজে।
বরজ কুলজ জলজ-নয়নি
ঘুমল বিমল কমল-বয়নি
রতি লালিস ভূম-বালিশ
আলিস নাহি তেজে॥

ভাদ্রমাসের অশ্রান্ত বর্ষণকেও হারাইয়া দিয়াছে তাঁহাদের মিলনের আনন্দের রসধারা। শয্যায় তাঁহারা পরম আদর ভরে শুইয়া আছেন। রাধা ব্রজকুলের কমলনয়নী, তাঁহার মুখখানি বিমল কমলের মতন। তিনি রতিশ্রমে এমন ক্লান্ত যে বালিশে মাথা দিবার পর্যন্ত উদ্যম নাই, দয়িতের বাহুকে বালিশ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। এখন অকরুণ বলে অরুণ উদিত হইলেও তাঁহার আলস্য

আর ভাঙ্গিতেছে না। গদ্যানুবাদের নীরস বাণীর সহিত কবির পদ মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যাইবে তিনি ভাষার কেমন যাদুকর।

শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর নামে দুই কবিভ্রাতাও ভাষার কারুকার্য যথেষ্ট দেখাইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ সংখ্যক পুথিতে শশিশেখর ভণিতায় আদালতের ভাষায় লিখিত শ্রীকৃষ্ণের এক খাতকনামা পাইয়াছি :

ইয়াদি কিধৎ গুণসমুদ্র শতসাধু শ্রীরাধা।
শত উদারস্থ চরিত তস্থ পুরাহ মনের সাধা॥
তস্থ খাতক হরি নায়ক বসতি ব্রজপুরি।
কস্য কার্য পত্রমিদং লিখি লেহ সুকুমারি॥
ঠামহি তব প্রেমদুর্লভ লই নাম কণ্ঠ করি।
ইহার লভ্য পাইবে ভব্য প্রেম অখিল ভরি॥
একুণে তিন বাঞ্ছা পূরব পরিশেষে কলিযুগে।
এই করারে খত লিখি দিলাম ইসাদি মঞ্জরি ভাগে॥
বসন্ত আগর তারিখ দ্বাপর শশিশেখর লেখনি।
করুণা কর রাধাপ্যারি এই খত লিখি দেওনি॥

(১৭৫০ সংখ্যক পদ)

এইপদে উর্দু-ফার্সি বয়ানের সঙ্গে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও ব্রজবুলির অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন) গ্রন্থে সংস্কৃত বুলি মেশানো একটি পদ যদুনন্দন ভণিতায় ধরা হইয়াছে :

ধৈর্যং রহু ধৈর্য রাই গচ্ছং মথুরাওয়ে।
ঢুঁড়ব পুরী প্রতি প্রতক্ষে
যাঁহা দরশন পাওয়ে।
ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা।
অবিলম্বনে মথুরপুর আওল ব্রজরমণা॥

(৮ম সং পৃঃ ৯৭)

যদুনন্দন দাস সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য। তিনি এই ধরণের পদ লিখিলে ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, পদামৃতসমুদ্র, সংকীর্তনামৃত, কীর্তনানন্দ, পদকল্পতরু ইত্যাদি কোন না কোন সংকলন গ্রন্থে ইহা ধৃত হইত। নবদ্বীপ ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক সংকলিত পদামৃতমাধুরীতে পদটি গোকুলানন্দের ভণিতায় দেখা যায় (৪।৮৭ পৃঃ)। উহার পাঠ অনেকটা পৃথক্ :

ধৈর্যং কুরু ধৈর্যং গচ্ছং মথুরায়ে।
ঢুঁড়ব হাম পুরি প্রত্যেকে যাঁহা দরশন পাওয়ে ॥
অতি ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং গতি গমনা।
অবিলম্বনে মথুরাপুরে প্রবেশ করল ভ্রমণা ॥

এই পাঠ বিশ্ববিদ্যালয়ধৃত পাঠ অপেক্ষা অনেক ভাল মনে হয়। যাহা হউক চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে পদাবলী যে কত বিচিত্র ভাষায় লিখিত হইয়াছিল তাহার একটু বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া হইল।